أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 113) www.motaher21.net

بَلَآءٌ مِّن رَّبِّکُمۡ عَظِیۡمٌ

" এক মহা পরীক্ষা ছিল।"

" A mighty trial."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪৯

وَ اِذۡ نَجَّیۡنٰکُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ یَسُوۡمُوۡنَکُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ یُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَکُمۡ وَ یَسۡتَحۡیُوۡنَ نِسَآءَکُمۡ ؕ وَ فِیۡ ذٰلِکُمۡ بَلَآءٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ عَظِیۡمٌ

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ফেরাউনী দলের দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবেহ করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিতো। মূলত এ অবস্থায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল।

৪৯ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা 'আলার গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, 'আদ, সামূদ, লূত ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ৬ষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে এখানে ফির 'আউন জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা 'আলা আলোচনা করেছেন। এছাড়াও কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এদের আলোচনা রয়েছে। (তারীখুল আম্বিয়া ১/১৩৬)

আল্লাহ তা 'আলা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ উলূল আযম নাবী মূসা ও বড় ভাই হারুনকে প্রেরণ করেছিলেন। কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত জাতি হল এরা। যেন উম্মতে মুহাম্মাদী ফির 'আউনের জাতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সীমালঙ্ঘনের মাত্রা ও তাদের পরিণতি দেখে হুশিয়ার হয়ে যায়। আল্লাহ তা 'আলা মূসা (আঃ) ও ফির 'আউনের কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন। কারণ এ নাবীর জীবন চরিত ও দাওয়াতী বিবরণে এবং ফির 'আউনের অবাধ্যতায় অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা 'আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর রহস্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে আসমানী কিতাবধারী ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের পেছনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং শেষ নাবীর ওপর ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে এদের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

বানী ইসরাঈল, মূসা (আঃ) ও ফির 'আউনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ইয়া 'কূব (আঃ)-এর অপর নাম 'ইসরাঈল' । হিব্রু ভাষায় 'ইসরাঈল' অর্থ আল্লাহ তা 'আলা দাস। সে হিসেবে ইয়া 'কূব (আঃ)-এর বংশধরকে 'বানু ইসরাঈল' বলা হয়।

ইয়া 'কূব (আঃ)-এর আদি বাসস্থান ছিল কেন 'আনে, যা বর্তমান ফিলিস্তিন এলাকায় অবস্থিত। তখনকার সময় ফিলিস্তিন ও সিরিয়া মিলিতভাবে শাম দেশ ছিল। এর গোটা অঞ্চলকে বর্তমানে 'মধ্যপ্রাচ্য' বলা হয়। ইয়া 'কূব (আঃ)-এর পুত্র ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের মন্ত্রী হন এবং অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কিন 'আনে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন ইউসুফ (আঃ)-এর আমন্ত্রণে পিতা ইয়া 'কূব (আঃ) সপরিবারে মিসরে চলে আসেন ও বসবাস শুরু করেন। ক্রমে সেখানে তাঁরা আধিপত্য বিস্তার করেন ও সুখ-শান্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকেন। পরবর্তীতে পুনরায় মিসর ফির 'আউনের অধিকারে ফিরে আসে। ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ৫ম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারুনের সময় নিপীড়ক ফির 'আউন শাসন ক্ষমতায় ছিল, তার নাম রেমেসীস-২।

মূসা (আঃ) হলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম 'ইমরান' । তাঁর জন্ম হয় মিসরে আর লালিত-পালিত হন ফির 'আউনের ঘরে। তাঁর জন্ম ও লালন পালন সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। তাঁর সহোদর ভাই হারুন ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড়। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরে বানী ইসরাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে একটি লাল টিবির দিকে ইশারা করে সে স্থানেই মূসা (আঃ)-এর কবর রয়েছে বলে জানিয়েছেন। (মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত হা: ৫৭১৩)

ফির ‘আউন কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। কিবতী বংশীয় এ সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিসর শাসন করে। এ সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড, স্ফিংক্র প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে।। মূসা (আঃ)-এর সময়কার পরপর দুজন ফির ‘আউন ছিল। সর্বসম্মত ইসরাঈলী বর্ণনাও হল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু’ জনেরই যুগ পান। উৎপীড়ক ফির ‘আনের নাম ছিল রেমেসিস-২ এবং ডুবে মরা ফির ‘আউন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্য ডুবে মরেন। যার মমি ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং আজও তার লাশ মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে।

আল্লাহ তা ‘আলা বানী ইসরাঈলের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতগুলো ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন: স্মরণ কর, তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করে ফির ‘আউন জঘন্যতম শাস্তি দিত। আমি তোমাদেরকে মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছি। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হলো- একদা ফির ‘আন স্বপ্নে দেখে যে, বায়তুল মুক্বাদ্দিসের দিক হতে এক আগুন এসে মিসরের প্রত্যেক কিবতীর ঘরে প্রবেশ করছে, কিন্তু তা বানী ইসরাঈলের ঘরে যায়নি। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে যার হাতে তার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাবে। তাই সে চারদিকে নির্দেশ জারি করে দিল যে, বানী ইসরাঈলের ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সরকারি লোক দ্বারা যাচাই করে দেখবে। যদি পুত্র সন্তান হয় তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলবে। আর যদি কন্যা সন্তান হয় তবে তাকে ছেড়ে দিবে। এ নীতি চালু অবস্থায় আল্লাহ তা ‘আলা মূসা (আঃ)-কে ঐ ফেরআউনের ঘরেই লালিত-পালিত করেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলছেন, পরিণত বয়সে নবুয়তী পেয়ে ফির ‘আউনের এ নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করার পর মূসা (আঃ)-এর সাথে স্বদেশ ত্যাগকালে যখন ফির ‘আউন দলবল নিয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও করতে এসেছিল আর তোমরা এমতাবস্থায় সমুদ্রের উপকূলে ছিলে যখন তোমাদের নাজাতের কোন উপায় ছিল না, এমতাবস্থায় আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দিলাম আর তোমরা মুক্তি পেলে। সুতরাং এসব নেয়ামত পেয়ে আল্লাহ তা ‘আলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং তাঁর বিধান মেনে চলা উচিত।

এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েক রুকূ’ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যেসব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলো সবই বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইসরাঈল জাতির যুব-বৃদ্ধ-শিশু নির্বেশেষে সবাই সেগুলো জানতো। তাই ঘটনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা না করে এক একটি ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসলে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চান সেটি হচ্ছে এই যে, একদিকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছিলেন আর অন্যদিকে তার জবাবে এসব হচ্ছে তোমাদের কীর্তিকলাপ।

‘আলে ফেরাউন’ শব্দের অনুবাদ করেছি আমি “ফেরাউনী দল।” এতে ফেরাউনের বংশ ও মিসরের শাসকশ্রেণী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যে চুল্লীর মধ্যে তোমাদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা থেকে তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে বের হও, না ভেজাল হয়ে – এরই ছিল পরীক্ষা। এত বড় বিপদের মুখ থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তি লাভ করার পরও তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হও কি না, এ মর্মেও ছিল পরীক্ষা।

কোন ব্যক্তি ফিরআউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফিরআউন নবজাত পুত্রসন্তানকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রীপরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে উল্লেখিত হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। এত বড় নেআমতের শুকরিয়া স্বরূপ নবীগণ কি করেছেন? হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা আগমন করলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা মহররমের দশ তারিখের সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে বললেন, ব্যাপারটি কি? তারা বললঃ এটি একটি ভাল দিন। এ দিনে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, ফলে মূসা ‘আলাইহিস সালাম এ দিন সাওম পালন করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমরা তোমাদের চেয়ে মুসার বেশি হকদার , তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দিনের সাওম পালন করলেন এবং লোকদেরকে সেদিনের সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন। ” [বুখারী: ২০০৪, মুসলিম: ১২৮]

অবশ্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সনদে (بلاء) শব্দের অর্থ, নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে। তখন উদ্দেশ্য হবে, তাদের নাজাত ছিল এক বড় নেয়ামত। [তাবারী]

সূরা আল্- বাকারাহ্

আয়াত - ৫০

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম এবং ফির ‘আউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম। আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।

৫০ নং আয়াতের তাফসীর:

ফির ‘আউন ও তার সেনাবাহিনী হতে বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করা হয়েছিলো

এ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ ইয়া ‘কূব (আঃ)-এর সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, মহান আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা তাদের স্মরণ করা উচিত যে, তিনি তাদেরকে ফির ‘আউনের জঘন্যতম শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। অভিশপ্ত ফির ‘আউন স্পপ্নে দেখেছিলো যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হতে এক আগুন জ্বলে উঠে মিসরের প্রত্যেক কিবতীর ঘরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা বানী ইসরাঈলের ঘরে যায়নি। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিলো এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে যার তার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার আল্লাহ দাবীর চরম শাস্তি তার হাতেই হবে। এ জন্যই সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি চারদিকে এ নির্দেশ জারী করে দিলো যে, বানী ইসরাঈলের ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সরকারী লোক যাচাই করে দেখবে। যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলা হবে। আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আরো ঘোষণা করলো যে, বানী ইসরাঈলের দ্বারা কঠিন ও ভারী কাজ করিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের মাথার ওপর ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। এখানে শাস্তির তাফসীর পুত্র সন্তান হত্যার দ্বারা করা হয়েছে। সূরাহ্ ইবরাহীমে একের সংযোগ অন্যের ওপর করা হয়েছে। ﴿ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ ﴾- (১৪ নং সূরাহ্ ইব্রাহীম, আয়াত নং ৬)এর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরাহ্ কাসাসের প্রথমে দেয়া হয়েছে।

يَسُوْمُوْنَكُمْ-এর অর্থ হচ্ছে ‘লাগিয়ে দেয়া’ এবং ‘সর্বদা করতে থাকা।’ অর্থাৎ তারা বরাবরই কষ্ট দিয়ে আসছিলো, যেহেতু এই আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছিলো যে, তারা যেন মহান আল্লাহর পুরস্কার রূপে দেয়া নি ‘য়ামতের কথা স্মরণ করে। এ জন্য ফির ‘আউনীদের শাস্তিকে ব্যাখ্যা হিসেবে পুত্র সন্তান হত্যা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর সূরাহ্ ইবরাহীমের প্রথমে অর্থাৎ ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা যেন মহান আল্লাহর নি ‘য়ামতকে স্মরণ করে। এ জন্য সেখানে সংযোগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যাতে নি ‘য়ামতের সংখ্যা বেশি হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্তি হতে এবং পুত্র সন্তান হত্যা হতে তাদেরকে মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন।

মিসরের আমালীক কাফির বাদশাহকে ফির ‘আউন বলা হতো। যেমন রোমের কাফির বাদশাহকে কাইসার বলা হয়। পারস্যে শাসকের উপাধি হলো কিসরা ইয়ামানের রাজার উপাধি ছিলো তুব্বা, আবিসিনিয়ার অর্থাৎ ইথিওপিয়া রাজার উপাধি ছিলো নিগাস বা নাজাসী এবং ভারতের কাফির বাদশাহকে বলা হতো বাতলীমুস।

ইবনু জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হলো, তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ফির ‘আউনের কবল থেকে রক্ষা করা ছিলো তোমাদের রবের তরফ থেকে রহমত। (তাফসীর তাবারী ২/৪৮) আমরা বলতে চাই যে, কষ্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করা দ্বারা তাদের প্রতি মহান আল্লাহ রহমত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ ﴿وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (২১ নং সূরাহ্ আম্বিয়া, আয়াত নং ৩৫) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾

আর আমি ভালো মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (৭ নং সূরাহ্ আ ‘রাফ, আয়াত নং ১৬৮)

আশুরায় সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গ

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় এসে যখন দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা আশুরার সিয়াম পালন করছে, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ দিন তোমরা সিয়াম পালন করো কেন?’ তারা উত্তরে বললোঃ ‘এ জন্য যে, এ কল্যাণময় দিনে বানী ইসরাঈল ফির‘আউনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলো এবং তাদের শত্রুরা ডুবে মরেছিলো। তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে মূসা (আঃ) এ সিয়াম পালন করেছিলেন।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে আমিই বেশি হকদার।’ সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও ঐ দিন সিয়াম পালন করেন এবং জনগণকে সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দেন। (মুসনাদ আহমাদ ১/২৯১, ফাতহুল বারী ৪/২৮৭, মুসলিম ২/৭৯৬, ইবনু মাজাহ ১/৫৫৩, নাসাঈ ২/১৫৭)

এখানে কিভাবে ফিরআউনের হাত থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন। অন্য আয়াতে এসেছে, “আর অবশ্যই আমি মূসাকে ওহী করে বলেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতেই চলে যান” [ত্বাহা ৭৭. আশ-শু'আরা: ৫২]

যাওয়ার পথে তার সামনে সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসাকে বললেন, “আপনি সমুদ্রকে লাঠি দিয়ে আঘাত করুন, ফলে তা ভাগ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল। ” [সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩]

আর এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র ভাগ করে দিলেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৫১

وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা মূসাকে চল্লিশ দিন-রাত্রির জন্য ডেকে নিয়েছিলাম, তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে নিজেদের উপাস্যে পরিণত করেছিল। সে সময় তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে।

৫১ নং আয়াতের তাফসীর:

(وَإِذْ وَاعَدْنَا)

'আর যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাত্রির অঙ্গীকার করেছিলাম' এখানে আল্লাহ তা 'আলা মূসা (আঃ)-কে তাওরাত দেয়ার জন্য যে ৪০ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলেন সে নেয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন। প্রথমে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলেন পরে দশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً)

"স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরও দশ দ্বারা সেটা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়।" (সূরা আ 'রাফ ৭:১৪২)

কিন্তু তারা সময় হওয়ার পূর্বেই ধৈর্যহারা হয়ে গেল। এমনকি মূসা (আঃ) চলে যাবার পর তারা গো-বৎসের পূজা/উপাসনা করতে শুরু করে দিল, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের ওপর জুলুম করল। তারপরও আল্লাহ তা 'আলা একজন আরেকজনকে হত্যা করার মাধ্যমে তাওবাহ করার নির্দেশ দিলেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা 'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।

অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা গো-বৎসকে তোমাদের মা 'বূদরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর জুলুম করেছ। অতএব একজন আরেকজনকে হত্যা করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তাওবাহ কর। জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকার চেয়ে এটা তোমাদের জন্য উত্তম। তারপর আল্লাহ তা 'আলা তাদের অবাধ্যতার সীমালঙ্ঘনের কথা তুলে ধরেছেন, যখন তারা আল্লাহ তা 'আলার কথা শুনল তখন মূসাকে বলল: এগুলো যে আল্লাহ তা 'আলার কথা তা আমরা কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ তা 'আলাকে দেখতে পাব। তাদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহ তা 'আলাকে দেখতে গেলে বজ্রধ্বনি তাদেরকে পাকড়াও করল। যার ফলে তারা সবাই মৃত্যু বরণ করল। অতঃপর মূসা (আঃ)-এর দু 'আয় তাদেরকে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দেয়া হলো। এভাবে তাদের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আল্লাহ তা 'আলা করুণা করে তাদের এ ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করেছেন কিন্তু তারা ছিল বড়ই অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ জাতি।

মিসর থেকে মুক্তি লাভ করার পর বনী ইসরাঈল যখন সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপে পৌঁছে গেলো তখন মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামকে চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তূর পাহাড়ে ডেকে নিলেন। ফেরাউনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে যে জাতিটি এখন মুক্ত পরিবেশে স্বাধীন জীবন যাপন করছে তার জন্য শরীয়াতের আইন এবং জীবন যাপনের বিধান দান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। (বাইবেল, নির্গমন পুস্তক, ২৪-২৭ এবং ২৮-৩১ পরিচ্ছেদ দেখুন)

বনী ইসরাঈলদের প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে গাভী ও ষাঁড় পূজার রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। মিসর ও কেনানে এর প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের পর বনী ইসরাঈল যখন অধঃপতনের শিকার হলো এবং ধীরে ধীরে কিবতীদের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়লো তখন অন্যান্য আরো বহু রোগের মধ্যে এ রোগটিও তারা নিজেদের শাসকদের থেকে গ্রহণ করেছিলো। (বাছুর পূজার এ ঘটনাটি বাইবেলের নির্গমন পুস্তকের ৩২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।)

বানী ইসরাঈলের গাভীর পূজা করা

এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) যখন চল্লিশ দিনের অঙ্গীকারে বানী ইসরাঈলের নিকট হতে তূর পাহাড়ে চলে যান তখন তারা বাছুর পূজা আরম্ভ করে দেয়। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের নিকট ফিরে এলে তারা এ শির্ক হতে তাওবাহ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা বলেন যে, এতো বড় অপরাধের পরেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এটা বানী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর কম অনুগ্রহ নয়। কুর' আন মাজীদে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّیِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ﴾

যখন আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাতের ওয়া 'দা করেছিলাম এবং আরো দশ বাড়িয়ে পুরা চল্লিশ করেছিলাম। (৭ নং সূরাহ্ আ 'রাফ, আয়াত নং ১৬৮) বলা হয় যে, এ ওয়া 'দার সময়কাল ছিলো যিলকাদার পুরা এক মাস এবং যিলহাজ্জ মাসের দশ দিন। এটা ফির 'আউনীদের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার

পরের ঘটনা। ‘কিতাব’ এর ভাবার্থ তাওরাত এবং ফুরকান প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয় যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এবং হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। এ কিতাবটিও উক্ত ঘটনার পরে পেয়েছিলেন, যেমন সূরাহ্ আ ‘রাফের এ ঘটনার বর্ণনা রীতি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে।

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآىِٕرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য-জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৮ নং সূরাহ্ কাসাস, আয়াত নং ৪৩)

এখানে গো বৎসের উৎস ও কারিগর সম্পর্কে কিছু বলেন নি। অন্যত্র সেটা বিস্তারিত এসেছে। আল্লাহ্ বলেন, "মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা ওটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম " [সূরা আল-আরাফ: ১৪৮]

আরও বলেন, “তারা বলল, আমরা আপনাকে দেয়া অংগীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করিনি ; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও (সেখানে কিছু মাটি) নিক্ষেপ করে। তারপর সে তাদের জন্য গড়লো এক বাছুর, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত। তারা বলল, "এ তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে। " [সূরা ত্বা-হাঃ ৮৭-৮৮]

এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন ফিরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর ইসরাঈল-বংশধররা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল, আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল। তখন মূসা ‘আলাইহিস সালাম-এর খেদমতে ইসরাঈল-বংশধররা আরয করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীআত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো। মূসা ‘আলাইহিস সালাম-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা অংগীকার প্রদান করলেন যে, আপনি তুর পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার পর আপনাকে এক কিতাব দান করবো। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তাই করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ‘আলাইহিস সালাম-কে অতিরিক্ত আরও দশদিন ইবাদাত করতে নির্দেশ দিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ‘আলাইহিস সালাম-কে তাওরাত দিলেন। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তো ওদিকে তুর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি শব্দ করতে থাকলো। আর ইসরাঈল-বংশধররা তারই পূজা করতে শুরু করে দিল। [তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন]

আয়াত ৫২

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৫৩

وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

স্মরণ করো (ঠিক যখন তোমরা এই যুলুম করছিলে সে সময়) আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা সোজা পথ পেতে পারো।

৫২-৫৩ নং আয়াতের তাফসীর:

ফুরকান’ দ্বারা হয়ত তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরীআতী বিধানমালাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, শরীআতের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে- যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার দাবীর ফয়সালা হয়। অথবা ফুরকানের মানে হচ্ছে দ্বীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি, যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। অথবা স্বয়ং তাওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

ফুরকান হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তোলা হয়। আমাদের ভাষায় এই অর্থটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য সবচাইতে কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে ‘মানদণ্ড। এখানে ফুরকানের মানে হচ্ছে দ্বীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৫৪

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ یٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَیْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ

স্মরণ করো যখন মূসা(এই নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো, “হে লোকেরা! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ওপর বড়ই যুলুম করেছো, কাজেই তোমরা নিজেদের স্রষ্টার কাছে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে হত্যা করো, এরই মধ্যে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে সময় তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৫৪ নং আয়াতের তাফসীর:

তাওবাহ কবূল হওয়ার জন্য বানী ইসরাঈলীদের একে-অন্যকে হত্যা করা

এখানে তাদের তাওবাহর পন্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বাছুরের পূজা করেছিলো এবং তার প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিলো। তারপর মূসা (আঃ)-এর বুঝানোর ফলে তাদের সঠিক জ্ঞান ফিরে আসে এবং তারা লজ্জিত হয় ও নিজেদের পথভ্রষ্টতার কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেনঃ যখন তাদের হৃদয় বাছুরকে পূজা করার চিন্তা-ভাবনা করছিলো তখন আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ

﴿وَ لَمَّا سُقِطَ فِیْۤ اَیْدِیْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا١ۙ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ یَغْفِرْ لَنَا﴾

আর যখন তারা লজ্জিত হলো এবং দেখলো যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বললোঃ আমাদের রাব্ব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। (৭ নং সূরাহ্ আ ‘রাফ, আয়াত নং ১৪৯) তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করেছে তাদেরকে যেন হত্যা করে ঐসব লোক যারা এতে যোগ দেয়নি। অতঃপর তারা তাই করে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং হত্যাকারী ও নিহত সবাইকেই ক্ষমা করে দেন। এর পূর্ণ বর্ণনা ইনশা’ আল্লাহ সূরাহ্ তা-হা’ য় আসবে। (সুনান নাসাঈ ৬/৪০৪, তাফসীর তাবারী ১৮/৩০৬, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৬৮)

একটি বর্ণনায় আছে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে মহান আল্লাহর নির্দেশ শুনিয়ে দেন এবং যেসব লোক বাছুর পূজা করেছিলো তাদেরকে বসিয়ে দেন এবং অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। আল্লাহ তা ‘আলার হুকুমে অন্ধকার হয়ে যায়। তারপর তাদেরকে বিরত রাখা হয়। তখন গণনা করে দেখা যায় যে, সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এবং যারা বেঁচে ছিলো তাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তাফসীর তাবারী ২/৭৩)

যখন মূসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায়কে শির্ক থেকে সতর্ক করলেন, তখন তাদের মধ্যে তাওবা করার প্রেরণা সৃষ্টি হল। তাওবার পদ্ধতি (প্রায়শ্চিত্ত) আপোস-হত্যা নির্বাচিত হল। {فَاقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ} (তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর) এই আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, (ক) সকলকে দুই কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা একে অপরকে হত্যা করে। (খ) যারা শির্ক করেছিল তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং যারা শির্ক থেকে বেঁচে ছিল, তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে শির্কমুক্তরা মুশরিকদেরকে হত্যা করে। হতদের সংখ্যা ৭০ হাজার বলা হয়েছ (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

৫৫ নং আয়াতের

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মূসা! আমরা মহান আল্লাহ কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করবো না’ । তখন বজ্র তোমাদের পাকড়াও করেছিলো। আর তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫৫ নং আয়াতের তাফসীর:

বানী ইসরাঈলের যারা মহান আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলো তাদের প্রাণ হরণ এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলের সত্তরজন লোককে সাথে নিয়ে মহান আল্লাহর ওয়া ‘দা অনুযায়ী তূর পাহাড়ে যান এবং ঐ লোকগুলো মহান আল্লাহর কথা শুনতে পায়, তখন তারা মূসা (আঃ)-কে বলেন যে, তারা মহান আল্লাহকে সামনে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবেনা। (তাফসীর তাবারী ২/৮১) এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার ফলে দেখেতে দেখতেই তাদের ওপর আকাশ হতে বিদ্যুতের গর্জনে এক ভয়াবহ উচ্চ শব্দ হয়, এর ফলে তারা সবাই মারা যায়। এদিকে মূসা (আঃ) বিলাপ করতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট আরয করেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ! আমি বানী ইসরাঈলকে কি উত্তর দিবো! এরা তো তাদের মধ্যে উত্তম ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিলো। হে প্রভু! আপনার এরূপ করার ইচ্ছা থাকলে ইতোপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে মেরে ফেলতেন। হে মহান আল্লাহ! অজ্ঞ লোকদের অজ্ঞতার কারণে আমাকে ধরবেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা মূসা (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ সত্তর ব্যক্তিও তাদের মধ্যে ছিলো যারা বাছুরের পূজা করেছিলো। অতঃপর মহান আল্লাহ সাথে সাথেই এক ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে দেন এ জন্য যে, অন্যান্যাদের জীবন কিভাবে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তা যেন সে অবলোকন করতে পারে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৩)

‘আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথনের পর মূসা (আঃ) যে প্রস্তরখণ্ডে তাওরাতের বাণী লিখিত হয়েছিলো তা সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছুরের পূজা করতে শুরু করেছে। এরপর তিনি মহান আল্লাহর আদেশে তাদেরকে একে অপরকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। তারা তা পালনও করে এবং মহান আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ এ পাথর খণ্ডগুলোতে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী, যাতে তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমরা কি পালন করবে এবং কি বর্জন করবে। তারা বললোঃ ‘তুমি বলেছো বলেই কি এ কথাগুলো বিশ্বাস করবো? মহান আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না মহান আল্লাহ নিজে এসে আমাদেরকে দেখা দেন এবং বলেনঃ এটা আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং তোমরা ইচ্ছা মেনে চলো। হে মূসা! তিনি যেমন তোমার সাথে কথা বলেছেন তদ্রুপ কোন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন না?’ অতঃপর ‘আবদুর রহমান ইবনু যায়দ (রহঃ) পাঠ করেনঃ মহান আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় ঈমান আনবো না।

সুতরাং তাদের ওপর গযব নিপতিত হলো, এক বজ্র-নিনাদ তাদের ওপর আপতিত হলো। ফলে তারা সবাই মারা গেলো। তারপর মহান আল্লাহ সেই মৃত লোকদের আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এরপর ‘আবদুর রহমান (রহঃ) পাঠ করেনঃ তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুর্নজীবিত করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এরপর বলেন, মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা মহান আল্লাহর এই কিতাব ধারণ করো। তারা বললোঃ না, তা হবার নয়। মূসা (আঃ) বললেনঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা উত্তরে বললোঃ শাস্তি স্বরূপ আমাদেরকে তো মৃত্যু দেয়া হয়েছিলো, এখন আমরা জীবন ফিরে পেয়েছি। তাদের অবাধ্যতার জন্য মহান আল্লাহ কয়েকজন ফিরিশতা পাঠালেন যারা তাদের মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরলো। (তাফসীর তাবারী ২/৮৮)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বানী ইসরাঈলরা পুর্নজীবন লাভ করার পরেও মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত আদেশসমূহ পালন করা তাদের জন্য আবশ্যকীয় ছিলো। অবশ্য মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন যে, এ বিষয়ে দু’ টি মতামত রয়েছে। প্রথম মতামত এই যে, যেহেতু বানী ইসরাঈলরা মৃত্যু এবং জীবন দানের মু ‘জিযাহ নিজেরাই অবলোকন করেছে, তাই তাদের আর আদেশ পালন করার দরকার নেই। দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে তাদেরকেও মহান আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস ও তা মেনে চলতে হবে যাতে অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্করাও তাদের দেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এটাই সঠিক কথা। তিনি বলেন যে, বানী ইসরাঈলের যে দলটি মু ‘জিযাহ প্রত্যক্ষ করেছে তার ফলে তাদের বিশ্বাস ও ‘আমল করা বাতিল হয়ে যায়না। কারণ তারাইতো ঐ ঘটনা ও বিপদের জন্য দায়ী ছিলো। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৫৬

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

কিন্তু আবার আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে জীবিত করলাম, হয়তো এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

৫৬ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছেঃ চল্লিশ-রাতের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লাম যখন তূর পাহাড়ে চলে গেলেন, আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিলেন বনী ইসরাঈলের সত্তর জন প্রতিনিধিকেও তাঁর সাথে নিয়ে আসার। তারপর মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সাল্লামকে কিতাব ও ফুরকান দান করলেন। তিনি তা ঐ প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন বলছে, ঠিক তখনই তাদের মধ্য থেকে কয়েক জন দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলতে থাকলো, মহান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলেছেন একথাটি আমরা শুধুমাত্র আপনার কথায় কেমন করে মেনে নিতে পারি? তাদের একথায় আল্লাহর ক্রোধ উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো এবং তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাইবেল বলছেঃ “তারা ইসরাঈলের খোদাকে দেখেছে। তাঁর চরণ তলের স্থানটি ছিল নীলকান্তমণি খচিত পাথরের চত্বরের ন্যায়। আকাশের মতো ছিল তার স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য। তিনি বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিদের ওপর নিজের হাত প্রসারিত করেননি। কাজেই তারা খোদাকে দেখেছে, খেয়েছে এবং পান করেছে।” (নির্গমন পুস্তক, ২৪ অনুচ্ছেদ, ১০-১১ শ্লোক)।মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই বাইবেলের আরো সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছেঃ “যখন হযরত মূসা (আঃ) খোদার কাছে আরজ করলেন, আমাকে তোমার প্রতাপ ও জ্যোতি দেখাও। জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারো না। ” (নির্গমন পুস্তক, ৩৩ অনুচ্ছেদ, ১৮-২৩ শ্লোক)।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৫৭

وَ ظَلَّلْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ

আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম, তোমাদের জন্য সরবরাহ করলাম মান্না ও সালওয়ার খাদ্য এবং তোমাদের বললাম, যে পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী আমরা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা কিছু করেছে তা আমাদের ওপর যুলুম ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

৫৭ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহর নি 'য়ামত স্বরূপ মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়া দান

ওপরে বর্ণিত হয়েছিলো যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক সুখ সম্ভোগ দান করেছেন।

একটা সাদা রংয়ের মেঘ ছিলো যা 'তীহের' মাঠে তাদের ওপর ছায়া দান করছিলেন যেমন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে। (সুনান নাসাঈ ৬/৪০৫) ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, ইবনু 'উমার (রাঃ), রাবী ' ইবনু আনাস (রহঃ), আবূ মুযলিজ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এটাই বলেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৪এ) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)-ও এ কথাই বলেন। ইবনু জারীর এবং অন্যান্য লোক বলেন যে, এ মেঘ সাধারণ মেঘ হতে বেশি ঠাণ্ডা ও উত্তম ছিলো। (তাফসীর তাবারী ২/৯১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা ঐ মেঘ ছিলো যার মধ্যে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন আগমন করবেন। আবূ হুযাইফা (রহঃ)-এর এটাই উক্তি।

'মান্না' ও 'সালাওয়া' এর বিবরণ

যে 'মান্না' তাদেরকে দেয়া হতো তা গাছের ওপর অবতারণ করা হতো।তারা সকালে গিয়ে তা জমা করতো এবং ইচ্ছা মতো খেয়ে নিতো। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, শিলার মতো 'মান্না' তাদের ঘরে নেমে আসতো, যা দুধের চেয়ে সাদা ও মধু অপেক্ষা বেশি মিষ্ট ছিলো। সুবহি সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবতারিত হতে থাকতো। প্রত্যেক লোক তার বাড়ীর জন্য ঐ পরিমাণ নিয়ে নিতো যা ঐ দিনের জন্য যথেষ্ট হতো। কেউ বেশি নিলে তা পচে যেতো। শুক্রবারে তারা শুক্র ও শনি এ দু' দিনের জন্য গ্রহণ করতো। কেননা শনিবার ছিলো তাদের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন। সে দিন তারা জীবিকা অন্বেষণ করতো না। রাবী ' ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন যে, 'মান্না' ছিলো মধু জাতীয় জিনিস যা তারা পানি দিয়ে মিশিয়ে পান করতো। ইমাম বুখারীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

'মান্না' ব্যাঙ-এর ছাতার অন্তর্গত এবং এর পানি চক্ষু রোগের ঔষধ। (ফাতহুল বারী ৮/১৪, সহীহ মুসলিম ৩/১৬১৯, জামি ' তিরমিযী ৬/২৩৫, সুনান নাসাঈ ৪/৩৭০, ইবনু মাজাহ ২/১১৪৩, মুসনাদ আহমাদ ১/১৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। জামি 'উত তিরমিযীতে আছেঃ

আজওয়াহ নামক মাদীনার এক প্রকার খেজুর হচ্ছে জান্নাতী খাদ্য ও বিষক্রিয়া নষ্টকারী এবং ব্যাঙের ছাতা 'মান্না' এর অন্তর্গত ও চক্ষুরোগে আরোগ্যদানকারী। (জামি ' তিরমিযী ৬/২৩৩, ২৩৫)

'সালওয়া' এক প্রকার পাখি, চড়–ই পাখি হতে কিছু বড়, রং অনেকটা লাল। দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত হতো এবং ঐ পাখিগুলোকে জমা করে দিতো। বানী ইসরাঈল নিজেদের প্রয়োজন মতো ওগুলো ধরতো এবং যবেহ করে খেতো। একদিন খেয়ে বেশি হলে তা পচে যেতো। শুক্রবার তারা দুই দিনের জন্য জমা করতো। কেননা শনিবার তাদের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন ছিলো। সেই দিন তারা 'ইবাদতে মশগুল থাকতো এবং ঐদিন শিকার করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৯) কোন কোন লোক বলেছেন যে, ঐ পাখিগুলো কবুতরের সমান ছিলো। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক মাইল জায়গা ব্যাপী ঐ পাখিগুলো বর্শা পরিমাণ উঁচু স্তুপ হয়ে জমা হতো। ঐ তীহের মাঠে ঐ দু' টি জিনিস তাদের খাদ্যরূপে প্রেরিত হতো, যেখানে তারা তাদের নবীকে বলেছিলোঃ 'এ জঙ্গলে আমাদের আহারের ব্যবস্থা কিরূপে হবে?' তখন তাদের ওপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতারিত হয়েছিলো। আল্লাহ তা 'আলা বলেনঃ ﴿كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ﴾

"তোমাদেরকে যা কিছু জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার করো।" (৭ নং সূরাহ্ আ 'রাফ, আয়াত নং ১৬০)

এ আয়াতে অতি সহজ সরল ভাষায় আদেশ করা হয়েছে যে, যা হালাল তা থেকে যেন মানুষ তাদের আহার্য গ্রহণ করে। তারপর মহান আল্লাহ বলেন, তারা আমার কোনই ক্ষতি করেনি, বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যে হালাল আহার্য দিয়েছেন তা থেকে খাদ্য গ্রহণ এবং তাঁর 'ইবাদত করার আদেশ করলে লোকেরা তা পালন না করে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমনটি অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ﴾

তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (৩৪ নং সূরাহ্ সাবা, আয়াত নং ১৫)

কিন্তু বানী ইসরাঈলরা অবাধ্য হলো। তারা ঈমান আনলো না এবং নিজেদের প্রতি যুল্ম করলো। তারা নিজেদের চোখে মু' জিযাহ প্রত্যক্ষ করলো এবং বিভিন্ন ঘটনার স্বাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান এনে ধন্য হতে পারলোনা।

অন্যান্য নবীর (আঃ) সহচর থেকে সাহাবীগণের (রাঃ) মর্যাদা

বানী ইসরাঈলের এ আচার-আচরণকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের (রাঃ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা কঠিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের ওপর ও আল্লাহ তা 'আলার 'ইবাদতের ওপর অটল ছিলেন। না তারা মু' জিযা দেখতে চেয়েছিলেন, না দুনিয়ার কোন আরাম চেয়েছিলেন। তাবূকের যুদ্ধে তারা ক্ষুধার জ্বালায় যখন কাতর হয়ে পড়েন, তখন যার কাছে যেটুকু খাবার ছিলো সব জমা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির করে বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদের এ খাবারের বরকতের জন্য প্রার্থনা করুন।' মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তা 'আলা সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাতে বরকত দান করেন। তারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হন এবং খাবারের পাত্র ভর্তি করে নেন। পিপাসায় তাদের প্রাণ শুকিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু 'আর বরকতে এক খণ্ড মেঘ এসে পানি বর্ষিয়ে দেয়। তারা নিজেরা পান করেন, পশুকে পান করান এবং মশক, কলস ইত্যাদি ভর্তি করে নেন। সুতরাং সাহাবীগণের এই অটলতা, দৃঢ়তাপূর্ণ আনুগত্য এবং খাঁটি একাত্মবাদী তাদেরকে মূসা (আঃ)-এর সহচরদের ওপর নিশ্চিতরূপে মর্যাদা দান করেছে।

অর্থাৎ প্রখর রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য যেখানে সিনাই উপদ্বীপে তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল ছিল না সেখানে আমরা মেঘমালার ছায়া দান করে তোমাদের বাঁচার উপায় করে দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈর মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর সিনাই উপত্যকায় গৃহ তো দূরের কথা সামান্য একটু মাথা গোঁজার মতো তাঁবুও তাদের কাছে ছিল না। সে সময় যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সময়ের জন্য আকাশকে মেঘাবৃত করে রাখা না হতো, তাহলে খর-রৌদ্র –তাপে বনী ইসরাঈলী জাতি সেখানেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

মান্না ও সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক প্রকার প্রাকৃতিক খাদ্য। বনী ইসরাঈররা তাদের বাস্তুহারা জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এই খাদ্য লাভ করতে থেকেছে। মান্না ছিল ধনিয়ার ধানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এক ধরনের খাদ্য। সেগুলোর বর্ষণ হতো কুয়াসার মতো। জমিতে পড়ার পর জমে যেতো। আর সালওয়া ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির কবুতরের মতো এক প্রকার পাখি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এই খাদ্যের বিপুল প্রাচুর্য ছিল। বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি জাতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই খাদ্যের ওপর জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনদিন অনাহারে থাকতে হয়নি। অথচ আজকের উন্নত বিশ্বের কোন দেশে যদি হঠাৎ কয়েক লাখ শরণার্থী প্রবেশ করে তাহলে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটি প্রাণান্তকর সমস্যায় পরিণত হয়। (মান্না ও সালওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বাইবেলের নির্গমন পুস্তকঃ ১৬ অনুচ্ছেদ, গণনাঃ ১১ অনুচ্ছেদ, ৭-৯ ও ৩১-৩৬ শ্লোক এবং ঈশুঃ ৫ অনুচ্ছেদ, ১২ শ্লোক)

নিম্নে তাদের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তা 'আলা বানী ইসরাঈলকে যে সকল নেয়ামত প্রদান করেছিলেন তা হল:

১. বানী ইসরাঈলের হিদায়াতস্বরূপ মূসা (আঃ)-কে আসমানী কিতাব তাওরাত প্রদান। (সূরা বাকারাহ ২:৫৩)

২. বিভিন্ন জঘন্য অপরাধ করার পরও আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা প্রদান। (সূরা বাকারাহ ২:৫২)

৩. ফির 'আউনের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান। (সূরা বাকারাহ ২:৪৯)

৪. সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি প্রদান। (সূরা বাকারাহ ২:৫০)

৫. বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত করা। (সূরা বাকারাহ ২:৬০)

৬. আসমানী খাদ্য মান্না ও সালওয়া প্রদান। (সূরা বাকারাহ ২:৫৭)

মান্না ও সালওয়া এক প্রকার আল্লাহ তা 'আলা প্রদত্ত খাদ্য যা একমাত্র বানী ইসরাঈলের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: সালওয়া হল এক প্রকার ছোট পাখি। ইকরামা বলেন: সালওয়া হল এক প্রকার পাখি যা চড়ুই পাখির ন্যায়। বারী বিন আনাস বলেন: মান্না মধু জাতীয় জিনিস যা তারা পানি দিয়ে মিশিয়ে পান করত।

হাদীসে এসেছে, ব্যাঙ-এর ছাতা মান্নার অর্ন্তভুক্ত, তার পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬৩৯) সঠিক কথা হচ্ছে মান্না হল মিষ্টি জাতীয় আর সালওয়া হল পাখির গোশত।

৭. সকল খাদ্য বানী ইসরাঈল এর জন্য হালাল করা। (সূরা আলি-ইমরান ৩:৯৩)

৮. তাদের মাঝে ধারাবাহিকভাবে নাবী-রাসূলগণের আগমন। যেমন হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

আবূ হুরাইরাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয়ই বানী ইসরাঈদের মধ্যে নাবীগণ ধারাবাহিকভাবে এসেছে। যখন কোন নাবী মারা গেছেন তখনই তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে অন্য নাবী। আর আমার পরে কোন নাবী নেই। (মুসনাদ আবূ আওয়ানা: ৭১২৮)

৯. স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপনের ব্যাবস্থাকরণ।

এ ছাড়াও বানী ইসরাঈলকে আরো অনেক নেয়ামত দান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এত নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা ‘আলার সাথে কুফরী করেছে, মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা করেছে। সুতরাং আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত, রাত-দিন আমরা আল্লাহ তা ‘আলার কত নেয়ামত ভোগ করছি, তিনি আমাদের ওপর কত অনুগ্রহ করছেন! কখনো যেন আমরা তাঁর সাথে কুফরী না করি, তাঁর নেয়ামত অস্বীকার না করি। বরং সর্বদা তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলব। আল্লাহ তা ‘আল্ া আমাদের তাওফীক দিন। (আমীন)!

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নেয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা ‘আলার শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

২. আল্লাহ তা ‘আলা বান্দাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন এটা জানার জন্য যে, কারা তাঁর দীনের ওপর অটল থাকে।

৩. বানী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার বিভিন্ন নেয়ামতের কথা জানতে পারলাম।

৪. যারা আল্লাহ তা ‘আলা ও রাসূলের বিরোধিতা করে তথা ইসলাম বিদ্রোহী হয় তাদের পরিণতি খুব খারাপ, যেমন মূসা (আঃ)-এর বিরোধী বানী ইসরাঈল জাতির হয়েছিল।